ইউনিট ৩

মানচিত্রে ভৌগোলিক উপাত্ত প্রদর্শনের বিভিন্ন পদ্ধতি

এই ইউনিটে মানচিত্রে ভৌগোলিক উপাত্ত প্রদর্শনের বিভিন্ন পদ্ধতি, যেমনঃ ভ্রুলেখ, ছায়াপাত পদ্ধতি, বিন্দু মানচিত্র এবং সমরেখ পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এবং কি করে পদ্ধতিগুলো হাতে-কলমে উপস্থাপন করা যায় তার সম্পর্কে ধারনা দেয়া হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ হচ্ছে-

পাঠ ৩.১ ঃ মানচিত্রে ভৌগোলিক উপাত্ত প্রদর্শনের বিভিন্ন পদ্ধতি
পাঠ ৩.২ ঃ লেখচিত্র
পাঠ ৩.৩ ঃ ছায়াপাত পদ্ধতি
পাঠ ৩.৪ ঃ ছায়াপাত মানচিত্র ঃ সমাধান
পাঠ ৩.৫ ঃ বিন্দু মানচিত্র
পাঠ ৩.৬ ঃ সমরেখ পদ্ধতি

পাঠ-৩.১

মানচিত্রে ভৌগোলিক উপাত্ত প্রদর্শনের বিভিন্ন পদ্ধতি

এই অংশটি পাঠ করে আপনি-

- **মানচিত্রে ভৌগোলিক উপাত্ত প্রদর্শনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।**

মানচিত্রে ভৌগোলিক উপাত্ত প্রদর্শনের যৌক্তিকতা এবং ভৌগোলিক উপাত্ত প্রদর্শনের বিভিন্ন পদ্ধতির উপর সাধারণ আলোচনা।

ভূগোলবিদরা স্কেল ও অভিক্ষেপের সাহায্যে মানচিত্র তৈরী করে থাকেন। কিন্তু শুধুমাত্র মানচিত্র তৈরীই নয় বিভিন্ন ভৌগোলিক উপাত্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে মানচিত্রে প্রদর্শন করাই মানচিত্র তৈরীর মূল উদ্দেশ্য। এই উপাত্ত বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন-কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের বা স্থানসমূহের ভিন্নতায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমদানী-রপ্তানির হিসাব, বিভিন্ন উৎপাদনের পরিমাণ, জন্ম-মৃত্যুর হার, লোকসংখ্যা, নারী-পুরুষ, জাতি ধর্ম বিন্যাসের হার, বাজেটের বিভিন্ন খাতে আয়-ব্যয়ের পরিমাণ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি নানা বিষয় মানচিত্রে দেখান হয়।

অর্থনীতি বা পরিসংখ্যান ছাড়াও ভূগোলেও পরিসংখ্যানগত উপাত্তের ব্যবহার হয়। পরিসংখ্যাগত উপাত্ত ভূগোলে `raw materials' হিসেবে কাজ করে। এই পরিসংখ্যানগত উপাত্ত ব্যবহার করে (diagram) ভিত্তিক চিত্র (diagrammatic maps), লেখচিত্র/মানচিত্র (Graph), এবং বিস্তরণ মানচিত্র (distribution maps) ইত্যাদি অঙ্কন করা যায়।

উপাত্তের প্রকৃতিগত ভিন্নতায় এই ভৌগোলিক উপাত্তের চিত্ররূপের উপস্থাপনও বিভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ- আবহাওয়াগত উপাত্তঃ এক্ষেত্রে তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথাক্রমে সামোঞ্চ (isotherm), সমতাপ (isobar), এবং সমোচ্চ রেখা (isohyet) প্রভৃতি চিত্ররূপ দেয়া যায়।

আবার কৃষি এবং শিল্প উপাত্ত অন্যভাবে উপস্থাপন করা হয়। এই উপাত্তসমূহ বিন্দু, প্রতীক চিহ্ন, রং এবং ছায়াপাত (sade) এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। এই সমস্ত উপাত্ত ভিত্তিক মানচিত্র উপাত্তের প্রকৃতির বিভিন্নতা ভেদে নানা উপায়ে উপস্থাপিত হয়। এ ক্ষেত্রে যে কোন একটি নির্দিষ্ট উপাদানের প্রকৃতি ভেদেও চিত্ররূপ প্রকাশের পদ্ধতির ভিন্নতা হতে পারে। কোন উপাত্তের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট চিত্ররূপ প্রকাশ পদ্ধতি বেছে নেয়া হবে তা বিবেচনায় আনতে হবে। উদাহরণস্বরূপ- জনসংখ্যার বিন্দু পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। আবার বিভিন্ন রং বা ছায়াপাত এর মাধ্যমে কোন এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব দেখান যায়। কিন্তু যখন বৎসর বা সময় ভেদে জনসংখ্যার পরিমাণ দেখানোর বিষয়টি আসে সে ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল উপস্থাপনের উপায় হচেছ লেখচিত্র। এভাবে বিভিন্ন উপাত্তের প্রকৃতিগত বিভিন্নতায় মানচিত্রাংকনবিদরা বিভিন্ন উপস্থাপন পদ্ধতি ও নকশা ব্যবহার করেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই সকল নকশা বা diagram এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গুরূত্বপূর্ণ দেখতে পাব। স্থানভেদে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের একই জিনিসের পরিসংখ্যান উপাত্ত এক হয় না। এই উপাত্তের সংখ্যা দেখে এদের তাৎপর্য উপলব্ধি করা বা তুলনামূলক স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সহজ নয়। এছাড়া, বিভিন্ন জিনিসের পরিমাণ জ্ঞাপক বড় বড় সংখ্যা মনে রাখাও সহজ নয়। কোন বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে চিত্ররূপ প্রদান করলে এক নজরে এদের তাৎপর্য বোধগম্য হয় । এবং বিষয়টি পরিষ্কার রূপে বুঝতে অনেক প্রশ্নের সমাধান হয় ও সময় বাঁচে।

মানচিত্রে বিভিন্ন ধরনের উপাত্ত পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে প্রদর্শনের জন্য সাধারণত যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমনঃ

(ক) লেখচিত্র (Graph)
(খ) ছায়াপাত (Choropleth or shade)
(গ) বিন্দু (Dot)
(ঘ) সমরেখ (Isopleth)

(ক) লেখচিত্র পদ্ধতিঃ পরিসংখ্যানমূলক বিভিন্ন উপাত্তকে কোন নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী চিত্রের সাহায্যে অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে প্রদর্শন করাকেই লেখচিত্র বলে। মানচিত্রে বিভিন্ন ধরণের উপাত্ত প্রদর্শনের জন্য যে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাদের মধ্যে লেখচিত্র হল একটি প্রধান ও অন্যতম পদ্ধতি।

(খ) ছায়াপাতঃ মানচিত্রে যখন ছায়াপাত ব্যবহার করে কোন উপাত্তকে প্রদর্শন করা হয় তখন তাকে ছায়াপাত পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতি দ্বারা গড় বন্টনমূলক উপাত্ত প্রদর্শনই বিশেষ সুবিধাজনক।

(গ) বিন্দু পদ্ধতিঃ যখন মানচিত্রে বিন্দুর সাহায্যে কোন উপাত্তের বিস্তরণ প্রদর্শন করা হয় তখন তাকে বিন্দু পদ্ধতি বলে।

(ঘ) সমরেখ পদ্ধতিঃ সমমান বিশিষ্ট বিভিন্ন স্থানকে মানচিত্রের উপর যে রেখা দ্বারা যোগ করা হয় সে রেখাকে সমমান রেখা বা আইসোপে-থ বলে। প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের উপাত্ত প্রদর্শনের জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১.শূন্যস্থান পূরন করুনঃ

১.১ স্কেল ও অভিক্ষেপের সাহায্যে মানচিত্র .....গণ তৈরী করে থাকেন।
১.২ মানচিত্র তৈরীর মূল উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ..... সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে মানচিত্র প্রদর্শন।
১.৩ মানচিত্রে উপাত্তের ..... বিভিন্নতা ভেদে নানা উপায়ে উপস্থাপিত করা।
১.৪ জনসংখ্যার বিস্তরণ পদ্ধতির জন্য ব্যবহার করা যায়।
১.৫ বৎসর বা সময় ভেদে জনসংখ্যার পরিমাণ দেখানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল উপায় হচেছ ..... এর মাধ্যম।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. মানচিত্রে বিভিন্ন ধরনের উপাত্ত পরিষ্কার ও সুন্দর ভাবে প্রদর্শনের জন্য সাধারণত যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় সেগুলো কি কি?
২. লেখচিত্র পদ্ধতি কি?
৩. ছায়াপাত পদ্ধতি কি?
৪. বিন্দু পদ্ধতি কি?
৫. সমরেখ পদ্ধতি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. মানচিত্রে ভৌগোলিক উপাত্ত প্রদর্শনের যৌক্তিকাতা কি? ভৌগোলিক উপাত্ত প্রদর্শনের বিভিন্ন পদ্ধতির ওপর সাধারণ আলোচনা করুন।

পাঠ-৩.২ লেখচিত্র

এই অংশটি পাঠ করে আপনি-

- **বিভিন্ন প্রকার লেখচিত্রও তাদের সুবিধা- বিভিন্ন প্রকার লেখচিত্র তাদের সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে জানব ।**

রেখার সাহায্যে অঙ্কিত পরিসংখ্যান উপাত্তের চিত্ররূপই লেখচিত্র। এক্ষেত্রে উপাত্তসমূহ নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী চিত্রের সাহায্যে অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে প্রদর্শন করা হয়।

লেখচিত্রের শ্রেণীবিভাগ

লেখচিত্রকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন-

১। রৈখিক লেখচিত্র (Line Graph)
২। স্তম্ভ লেখচিত্র (Bar Graph)
৩। বৃত্ত বা চক্র লেখচিত্র (Circular or pie Graph)
৪। চিত্রের মাধ্যমে লেখচিত্র (Pictoral Diagrams বা Pictograms)

১। রৈখিক লেখচিত্র ঃ যখন রেখার সাহায্যে লেখচিত্র অঙ্কন করা হয়, তখন তাকে রৈখিক লেখচিত্র বলে। সাধারণত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তথ্যগুলোর চিত্রগুলোর চিত্ররূপ প্রদান করার জন্য এ ধরণের লেখচিত্র ব্যবহৃত হয়। জলবায়ু সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (যেমন-উপাত্ত), কৃষিপণ্যের উৎপাদন, শিল্পোৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি প্রভৃতি এ পদ্ধতিতে দেখান যায়।

সুবিধা ঃ

(ক) রেখচিত্রের সাহায্যে যে কোন উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধির প্রবণতা অতি সহজেই দেখান যায়।
(খ) এর দ্বারা একটি তথ্যের সাথে অপরটির তুলনামূলক সম্পর্ক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

অসুবিধা ঃ

(ক) অন্যান্য লেখচিত্রের ন্যায় এটি অধিক চিত্তাকর্ষক নয়।
(খ) সুবিধার মন্তব্যের সাথে পরস্পর বিরোধী

২। স্তম্ভ লেখচিত্র ঃ তুলনামূলক কোন উপাত্তকে যখন স্তম্ভের সাহায্যে প্রদর্শন করা হয়, তখন তাকে স্তম্ভ লেখচিত্র বলা হয়।

সুবিধা ঃ

(ক) স্তম্ভ লেখচিত্র দ্বারা একই প্রকার উপাত্তের বিভিন্ন অথবা বিভিন্ন স্থান বা সময়ের দেশের তুলনামূলক রূপ সহজেই প্রকাশ করা যায়।
(খ) এটি অঙ্কন করা সহজ, গণনার জটিলতা নেই এবং দেখতে বেশ চিত্রাকর্ষক।
(গ) এতে পরিসংখ্যানের মান সহজেই বুঝা যায়।

৩। বৃত্ত লেখচিত্র ঃ বৃত্তের সাহায্যে উপাত্তকে উপস্থাপন করাকে বৃত্ত বা পাই লেখচিত্র বলে। এ ধরনের লেখচিত্রে আয়তন বৃত্ত অঙ্কন করে দেখান হয়। স্কেল অনুসারে বৃত্তটিকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে বিভিন্ন উপাত্তের দেখান হয়।

সুবিধা ঃ

(ক) বৃত্ত লেখচিত্রের দ্বারা একটি উৎপাদনের বা উপাত্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলোর আনুপাতিক বিস্তৃতিকে চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা সহজ।
(খ) কতিপয় তথ্যের পরস্পরের মধ্যে এবং ঐ তথ্যগুলোর সমষ্টির সাথে প্রতিটি তথ্যের সম্পর্ক বুঝান সহজ।
(গ) এটি দেখতে চিত্তাকর্ষক।

অসুবিধা ঃ এটি দেখা মাত্র সঠিক তথ্য বুঝা যায় না।

৪। চিত্রের মাধ্যমে লেখচিত্র ঃ উপাত্ত সমূহকে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপনকে লেখচিত্র বলে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাত্তের সাপেক্ষে এক একটি চিত্রকে প্রতীক হিসেবে ধরে উপস্থাপন করা হয়। এ ক্ষেত্রে কিছু বিষয় সম্পর্ক সচেতন থাকা আবশ্যক। যেমন-

প্রতীক ঃ প্রতীক চিহ্নটি যেন নির্দিষ্ট উপাত্ত বিষয়ক অর্থ প্রকাশ করে। বিভিন্ন দেশের গাড়ির সংখ্যা বুঝাতে মানুষের চিত্র দিলে হবে না। আবার শহরের জনসংখ্যা বুঝাতে মানুষের চিত্রই প্রতীক রূপে ব্যবহার করতে হবে।
প্রতীক চিহ্নগুলো সহজবোধ্য ও সরল হতে হবে।

সুবিধা ঃ চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করায় এটি অত্যন্ত সহজবোধ্য। একজন অজ্ঞ ব্যক্তিও ঐ চিত্ররূপ দেখে উপাত্তগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

অসুবিধা ঃ চিত্র লেখচিত্রের উপস্থাপনে মোটামুটি বা সামগ্রিক অবস্থা বুঝায়, সুক্ষ্ম পরিমান বোঝায় না। উপাত্তগুলোকে সঠিকভাবে না দেখিয়ে প্রায় কাছাকাছি অবস্থা দেখান হয়।

চিত্রে ৩.২.১

চিত্রে ৩.২.২

চিত্রে ৩.২.৩

চিত্রে ৩.২.৪

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১.সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' উত্তর দিনঃ

১.১. ছায়াপাত পদ্ধতিতে অঙ্কিত পরিসংখ্যান উপাত্তের চিত্ররূপই লেখচিত্র।
১.২. রৈখিক লেখচিত্র অন্যান্য রেখচিত্রের ন্যায় অধিক চিত্তাকর্ষক নয়।
১.৩. বৃত্ত লেখচিত্রে আয়তন বৃত্ত অঙ্কন করে দেখান হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. লেখচিত্র কাকে বলে?
২. রৈখিক লেখচিত্র কাকে বলে?
৩. স্তম্ভ লেখচিত্র কি?
৪. বৃত্ত লেখচিত্র কি?
৫. চিত্র লেখচিত্র কি?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। বিভিন্ন প্রকার লেখচিত্র এবং তাদের সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করুন।

পাঠ-৩.৩ ছায়াপাত পদ্ধতি (Choropleth or Shading Method)

এই অংশটি পাঠ করে আপনি-

- **মানচিত্র অংকনে ছায়াপাত পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।**

যে সব মানচিত্রে বিভিন্ন উপাত্তের বিন্যাস বা ঘনত্ব দেখান হয় সে মানচিত্রকে ক্লোরোপ্লেথ বা ছায়াপাত মানচিত্র বলে। বিভিন্ন প্রকারের রেখা দ্বারা সৃষ্ট ছায়াপাত ব্যবহার করে এ ধরনের মানচিত্র তৈরী করা হয়। এক্ষত্রে উৎপাদনের প্রগাঢ়তা বা ঘনত্বের ভিন্নতায় ছায়াপাতের প্রয়োগের ভিন্নতা হয়। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ঘনত্বের জন্য ছায়া ঘনত্ব অনুসারে হালকা থেকে গাঢ় করে দেখান হয়। কম ঘনত্ব অঞ্চলে হালকা ছায়া এবং উপাত্তের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ঘনত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে ছায়া ক্রমশ গাঢ় থেকে আরো অধিক গাঢ় করা হয়।

ছায়াপাত পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্র ঃ

এ পদ্ধতির দ্বারা গড় বন্টনমূলক উপাত্ত প্রদর্শনী বিশেষ সুবিধাজনক। ছায়াপাত পদ্ধতি ব্যবহার করে জনসংখ্যার ঘনত্ব, উৎপাদন ঘনত্ব, জনসংখ্যার পরিবর্তন, ভূমির ব্যবহার, মৃত্তিকার বন্টন, উদ্ভিদের বন্টন প্রভৃতি দেখান যায়।

ছায়াপাত অঙ্কন পদ্ধতি ঃ

ছায়াপাত বিন্যাসের সময় প্রশাসনিক বিভাগ (জেলা বা উপজেলা) অবলম্বন করতে হয়। কারণ উপাত্তগুলো প্রশাসনিক বিভাগ অনুসারেই পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে সমগ্র অঞ্চলটিকে কয়েকটি সুবিধাজনক এককে বিভক্ত করে প্রত্যেক এককের জন্য আলাদা ছায়াপাত সূচক ব্যবহার করতে হয়। এ কাজের জন্য পছন্দমত পরিকল্পনা করে মানচিত্রের উপরের অংশ বা যে কাগজে মানচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তার মানানসই কোন স্থানে এর সূচক বা সাংকেতিক চিহ্ন দেখাতে হয়। চিত্রঃ ছায়াপাত মানচিত্র।

সুবিধা অসুবিধা ঃ ছায়াপাত পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। যেমন-

সুবিধাঃ

১. ছায়াপাতের সাহায্যে গড় বন্টনমূলক উপাত্ত প্রদর্শন খুবই সুবিধজনক।
২. বিভিন্ন উপাত্ত অত্যন্ত সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে মানচিত্রে প্রদর্শন করা যায়।
৩. প্রশাসনিক বিভাগ অনুযায়ী ছায়াপাত করা হয় বলে এরূপ চিত্রের বৈশিষ্ট্য সহজেই বুঝা যায়।
৪. ছায়াপাত সূচক স্কেল প্রথমেই নির্বাচন করা হয় বলে এ পদ্ধতি ব্যবহারে কোন জটিলতা দেখা দেয় না।

অসুবিধাঃ

১. ছায়াপাত পদ্ধতি অভৌগোলিক। কারণ এতে রাজনৈতিক বিভাগ অনুসারে ছায়াপাত করা হয়। এতে ভৌগোলিক এলাকার পরিবর্তে রাজনৈতিক এলাকার প্রধান্য বেশি প্রকাশ পায়। ফলে জনসংখ্যার ঘনত্বের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ঘনত্বের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা যায় না। আবার রাজনৈতিক অঞ্চলের সর্বত্র ঘনত্বের পরিমাণ সমান হয় না। ফলে ছায়াপাত মানচিত্রে জনসংখ্যার ঘনত্বের আঞ্চলিক পার্থক্যের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায় না।
২. অঞ্চল ভিত্তিক ছায়াপাত করা হয় বলে এতে কোন স্থানের প্রকৃত ঘনত্ব বুঝা যায় না।
৩. ছায়াপাত করার সময় অধিক ধৈর্য্য ও একাগ্রতার প্রয়োজন হয়। আবার ছায়াপাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট যত্নবান হতে হয় যাতে ঘনত্বের ক্রমধারা বোঝা যায়।

ছায়াপাত পদ্ধতিঃ সমাধান ১

আজকের পাঠে ছায়াপাত পদ্ধতি ব্যবহার করে জনসংখ্যার বিস্তরণ ভিত্তিক মানচিত্র উপস্থাপন পদ্ধতি দেখব।
নিচের উপাত্তটির সাহায্যে ছায়াপাত পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশের মহিলা জনসংখ্যার বিস্তরণ দেখান হল।

উপাত্তঃ

সারণি বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিস্তরণ ১৯৯১

জেলার নাম	মহিলা জনসংখ্যা %	জেলার নাম	ঘনত্ব	জেলার নাম	ঘনত্ব
বান্দরবান	৪৪.১৭	খাগড়াছড়ি	৪৯.৯৯	রাঙ্গামাটি	৪৫.১৫
চট্টগ্রাম	৪৬.৭৭	কক্সবাজার	৪৭.৬৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৪৯.১৩
কুমিল্লা	৪৯.৫০	চাঁদপুর	৪৯.৯৫	ফেনী	৪৯.৭২
লক্ষীপুর	৪৯.৬৯	নোয়াখালী	৫০.৪২	হবিগঞ্জ	৪৯.৩৪
মৌলভীবাজার	৪৯.৯৮	সুনামগঞ্জ	৪৮.৭৭	সিলেট	৪৮.৮২
ঢাকা	৪৪.৬৯	গাজীপুর	৪৭.৮৭	মানিকগঞ্জ	৪৯.৭০
মুন্সিগঞ্জ	৪৮.৬৫	নারায়ণগঞ্জ	৪৬.৪০	নরসিংদী	৪৮.২৪
ফরিদপুর	৪৮.৯০	রাজবাড়ী	৪৮.২৬	গোপালগঞ্জ	৪৯.৫৩
মাদারীপুর	৪৯.০২	শরিয়তপুর	৪৮.৫৯	জামালপুর	৪৮.৭২
শেরপুর	৪৮.৯৩	নওগাঁ	৪৮.৯৮	নাটোর	৪৭.৩৭
নবাবগঞ্জ	৪৮.৪২	রাজশাহী	৭৮৪	ময়মনসিংহ	৪৮.৯৫
কিশোরগঞ্জ	৪৯.১০	নেত্রকোনা	৪৮.৯৪	টাঙ্গাইল	৪৯.০৫
বরিশাল	৪৮.৮০	ঝালকাঠী	৪৯.৬৭	পিরোজপুর	৪৯.৫৮
ভোলা	৪৮.৩৭	পটুয়াখালী	৪৮.৫৬	বরগুনা	৪৯.৫৫
যশোর	৪৮.২৯	ঝিনাইদহ	৪৮.৪৮	মাগুরা	৪৮.৮৯
নড়াইল	৪৯.৩১	বাগেরহাট	৪৮.৭৭	খুলনা	৪৭.৫৫
মেহেরপুর	৪৮.৮৮	বগুড়া	৪৮.৮৬	জয়পুরহাট	৪৮.২৪
দিনাজপুর	৪৮.৩৭	ঠাকুরগাঁ	৪৮.৪৪	পঞ্চগড়	৪৮.৭৩
পাবনা	৪৮.৩১	সিরাজগঞ্জ	৪৮.৫৬	রংপুর	৪৮.৫৭
গাইবান্ধা	৪৯.৪৫	কুড়িগ্রাম	৪৯.৬৮	লালমনিরহাট	৪৮.৬০
নীলফামারী	৪৮.৬০	চুয়াডাঙ্গা	৪৮.৪৫	কুষ্টিয়া	৪৮.৩৪
সাতক্ষীরা	৪৯.১৪				

অঙ্কন পদ্ধতিঃ

ছায়াপাতের সাহায্যে মহিলা জনসংখ্যার বিস্তরণ দেখাতে প্রথমে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বিস্তরণ বের করতে হবে। এরপর সুবিধামত শ্রেণীতে ভাগ করতে হবে। যেমন: এই উপাত্তের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মহিলা নোয়াখালী জেলায় ৫০.৪২ দেখা যাচ্ছে এবং সবচেয়ে কম মহিলা বান্দরবান জেলায় ৪৪.১৭ দেখা যাচ্ছে। কাজেই ৪৪.১৭ থেকে ৫০ এর মধ্যে উপযোগী শ্রেণীগুলো করতে হবে। যেমনঃ ৪৪-৪৫, ৪৫.১-৪৬, ৪৬.১-৪৭, ৪৭.১-৪৮, ৪৮.১-৪৯ এবং ৪৯.১-৫০। এরপর উপরোক্ত শ্রেণীগুলোর প্রতিটির অন্তর্ভূক্ত জেলাগুলো বের করব। যেমন- ৪৪ থেকে ৪৫ শ্রেনীর মধ্যে যে জেলাগুলো পড়ে সেগুলো খুজে বার করব। এভাবে একে একে সব শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত জেলাগুলো বের করে ফেলব।

পরবর্তী পর্যায়ে ছায়াগুলো ঠিক করব। যেমন- সবচেয়ে কম ঘনত্বের শ্রেণীটি কম ঘনত্বের ছায়াপাত এবং সবচেয়ে বেশী ঘনত্বের বিস্তরণ উপস্থাপনকারী শ্রেণীটির ছায়াপাত সবচেয়ে ঘন বিস্তরণ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে (চিত্রঃ ৩.৩.১)।

চিত্র: ৩.৩.১

এভাবে এই ছায়াগুলো নির্দিষ্ট করে তৈরী করার পর মানচিত্রের যে সব অঞ্চলে যে সব ছায়ার প্রয়োজন হয় সেসব অঞ্চলে ঐ নির্দিষ্ট ছায়াগুলো অঙ্কন করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

১.১. যে সব মানচিত্রে বিভিন্ন উপাত্তের---------- বা --------- দেখান হয় সে মানচিত্রকে ছায়াপাত মানচিত্র বলে।

১.২. কম ঘনত্ব অঞ্চলে---------- ছায়া ব্যবহার করা হয়।

১.৩. এ পদ্ধতির দ্বারা গড় ---------- উপাত্ত প্রদর্শনই বিশেষ সুবিধাজনক।

১.৪. ছায়াপাত বিন্যাসের সময় ---------- বিভাগ অবলম্বন করতে হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. ছায়াপাত পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় এমন তিনটি ক্ষেত্র কি কি?

২. ছায়াপাত পদ্ধতির ক্ষেত্রে উপাত্তগুলো কি অনুসারে পাওয়া যায়?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ছায়াপাত পদ্ধতি কি? এই পদ্ধতি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়?

পাঠ-৩.৪ ছায়াপাত মানচিত্র ঃ সমাধান ২

এই অংশটি পাঠ করে আপনি-

- **ছায়াপাত মানচিত্র উপস্থাপন সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।**

আজকের পাঠে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্বের পরিসংখ্যান ছায়াপাত পদ্ধতিতে উপস্থাপনের পদ্ধতি দেখাব।
উদাহরণঃ নিচের সারণিতে বাংলাশের জেলা ওয়ারী ১৯৯১ সালের প্রতিবর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা ঘনত্বের পরিসংখ্যান দেওয়া হল। ছায়াপাত পদ্ধতিতে এটি দেখাতে হবে।

সারণি : বাংলাদেশের জনসংখ্যা ঘনত্ব ১৯৯১

জেলার নাম	ঘনত্ব	জেলার নাম	ঘনত্ব	জেলার নাম	ঘনত্ব
বান্দরবান	৫২	খাগড়াছড়ি	১২৭	রাঙ্গামাটি	৬৬
চট্টগ্রাম	১০০২	কক্সবাজার	৫৬৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১১১২
কুমিল্লা	১৩০৭	চাঁদপুর	১১৯২	ফেনী	১১৮২
লক্ষীপুর	৯০১	নোয়াখালী	৬১৬	হবিগঞ্জ	৫৭৯
মৌলভীবাজার	৪৯২	সুনামগঞ্জ	৪৬৬	সিলেট	৬১৭
ঢাকা	৩৯৮৯	গাজীপুর	৯৩২	মানিকগঞ্জ	৮৫৩
মুন্সিগঞ্জ	১২৪৪	নারায়ণগঞ্জ	২৩১২	নরসিংদী	১৪৪৭
ফরিদপুর	৭২৬	রাজবাড়ী	৭৪৬	গোপালগঞ্জ	৭১২
মাদারীপুর	৯৩৪	শরিয়তপুর	৮০৭	জামালপুর	৯২২
শেরপুর	৮৩৫	নওগাঁ	৬২৫	নাটোর	৭৩২
নবাবগঞ্জ	৬৮৮	রাজশাহী	৭৮৪	ময়মনসিংহ	৯০৭
কিশোরগঞ্জ	৮৫৮	নেত্রকোনা	৬১৬	টাঙ্গাইল	৮৭৫
বরিশাল	৭৯১	ঝালকাঠী	৮৭৯	পিরোজপুর	৮১৩
ভোলা	৪৩৪	পটুয়াখালী	৩৯৮	বরগুনা	৪২৪
যশোর	৮২১	ঝিনাইদহ	৬৯৪	মাগুরা	৬৯০
নড়াইল	৬৬৩	বাগেরহাট	৩৬১	খুলনা	৪৫৮
মেহেরপুর	৬৮৭	বগুড়া	৯১৪	জয়পুরহাট	৭৯৩
দিনাজপুর	৬৫৭	ঠাকুরগাঁ	৫৫৯	পঞ্চগড়	৫০৭
পাবনা	৮১০	সিরাজগঞ্জ	৯০৬	রংপুর	৯৩৬
গাইবান্ধা	৮৯৪	কুড়িগ্রাম	৬৯৮	লালমনিরহাট	৭৬৭
নীলফামারী	৮২২	চুয়াডাঙ্গা	৬৯৭	কুষ্টিয়া	৯২৭
সাতক্ষীরা	৪১৪				

কোন একটি অঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যাকে ঐ অঞ্চলের আয়তন দ্বারা ভাগ করলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়। বাংলাদেশের কোন এলাকায় বনভূমি, কোথাও বিল-হাওড়-বাওড় প্রভৃতি স্থায়ী জলাভূমি, কোথাও উঁচু পাহাড় এবং কোথাও উর্বর শস্যক্ষেত্র রয়েছে। ফলে দেশের সর্বত্র জনসংখ্যা ঘনত্ব একরূপ নয়। কিন্তু ছায়াপাত পদ্ধতি অবলম্বনের সময় ক্ষুদ্র এলাকার তারতম গ্রাহ্য না করে প্রশাসনিক বিভাগ অনুযায়ী জনসংখ্যা ঘনত্ব দেখাবার জন্য ছায়াপাত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

১৯৯১ সালের জনসংখ্যা ঘনত্বের তথ্যগুলোকে সূচক (Index) অনুসারে বিভিন্ন ছায়াপাতের সাহায্যে মানচিত্রে দেখাতে হবে। সূচক নির্বাচনের সময় কম ঘনত্ব বিশিষ্ট অঞ্চলে হালকা ছায়াপাত এবং ঘনত্ব বৃদ্ধির সংগে সংগে ক্রমা হয়ে গাঢ় থেকে অধিকতর গাঢ় ছায়াপাত করতে হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সমব্যবধানে ছায়াপাত নির্বাচনের সময় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২০০ চেয়ে কম ঘনত্ব বিশিষ্ট জেলার জন্য বিন্দু ছায়াপাত ২০০ থেকে ৫৯৯ ঘনত্ব বিশিষ্ট জেলাগুলোর জন্য উলম্ব রেখা; ৬০০ থেকে ৭৯৯ ঘনত্ব বিশিষ্ট জেলাগুলোর জন্য ডান দিকে বাঁকা রেখা ৮০০; থেকে ৯৯৯ ঘনত্ব বিশিষ্ট জেলাগুলোর জন্য বাম দিকে বাঁকা রেখা; ১০০০ থেকে ১৯৯৯ ঘনত্ব বিশিষ্ট জেলাগুলোর জন্য অনুভূমিক ও উলম্ব ঘন ঘন সরু রেখা; ২০০০ থেকে বেশী
(প্রতি ছায়াপাত পৃথক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্বের মধ্যে সে ব্যবধান নেয়া হয়েছে তার মধ্যে তারমত্য রয়েঠে- ২০০০-৫৯৯, ব্যবধান = ৩৯৯, ৬০০-৭৯৯ ব্যবধান= ১৯৯, ৮০০-৯৯৯ ব্যবধান=১৯৯, ১০০০-১৯৯৯ ব্যবধান=৯৯৯)
ঊর্ধ্ব ঘনত্ব বিশিষ্ট জেলাগুলোর জন্য উলম্ব ও অনুভূমিক মোটা রেখা ছায়াপাত নির্বাচন ও অঙ্কন করা হল। অতঃপর এ ছায়াপাত ব্যবহার করে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ঘনত্বের মানচিত্র (চিত্র-৩.৪.১) অঙ্কন করা হল।

চিত্র: ৩.৪.১.

পাঠ-৩.৫ বিন্দু মানচিত্র (Dot Map)

এই অংশটি পাঠ করে আপনি-

- **বিন্দু পদ্ধতি ব্যবহার করে মানচিত্রে উপাত্ত উপস্থাপনের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।**

আজকের পাঠে আমরা বিন্দু পদ্ধতি ব্যবহার করে মানচিত্রে উপাত্ত উপস্থাপনের পদ্ধতি দেখব।

মানচিত্রে উপাত্তের বিপরীতে বিন্দু ব্যবহার করে উপাত্তগুলোর উপস্থাপনের পদ্ধতিকে বিন্দু পদ্ধতি বলে।

এক্ষেত্রে মানচিত্রে বিন্দু স্থাপন করে বন্টনমূলক উপাত্তগুলোকে প্রদর্শন করা হয়। জনসংখ্যার ঘনত্ব, কৃষিজ পণ্য, কৃষি জমির পরিমাণ ইত্যাদির বন্টন দেখাতে এ পদ্ধতি বেশি ব্যবহৃত হয়। তবে এই পদ্ধতিতে প্রকৃত সংখ্যা দেখানো হয়। অর্থাৎ শতাংশ বা অনুপাত নয়। এতে প্রতিটি বিন্দু স্কেল অনুসারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্তুকে নির্দেশ করে থাকে এবং স্কেল অনুসারে বিন্দুর সংখ্যা গণনা করে বিভিন্ন বস্তুর বন্টন সঠিকভাবে মানচিত্রে বসান হয়। যেখানে প্রদর্শিত বস্তুগুলোর পরিমাণ বেশি সেখানে বিন্দুগুলো বেশি ঘন (কাছাকাছি) এবং যেখানে কম সেখানে কম ঘন করে বসাতে হয়।

পদ্ধতিঃ

জনসংখ্যার বন্টন দেখাতে বিন্দু পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা উপযোগী। প্রথমেই মানচিত্র তৈরীর ক্ষেত্রে স্কেলটিকে সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে। স্কেল নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের পরিমাণ ও মানচিত্রের আয়তন প্রধান বিবেচ্য বিষয়। স্কেলটা এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন মানচিত্রে একই স্থানে অযথা বিন্দুর সংখ্যা বেশি না হয়। আবার যে সমস্ত স্থানে লোক খুব কম বাস করে বা একেবারেই বাস করে না এরকম এলাকাগুলোও যেন বোঝা যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মানচিত্রে বিন্দু স্থাপনের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যে, কোন অংশই যেন বাদ না পড়ে। চিত্র-

তবে খুব বন্ধুর বা অতি শুষ্ক মরু এলাকা, বনাঞ্চল বা জলাশয় যেখানে মানব বসতি থাকে না বললেই চলে ঐ সব স্থানগুলোতে বিন্দু স্থাপন না করাই শ্রেয়। স্কেল অনুসারে গণনা করে বিন্দুগুলো বসাতে হয়। কিন্তু প্রতিটি বিন্দুর আকৃতি একই ধরনের হতে হবে। নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে জনবসতি বেশি হয় বলে সেখানে সাধারণত বিন্দু বেশি দেওয়া হয়। আবার বিন্দুর সমাবেশ শহর অঞ্চলে ঘন এবং গ্রামীণ অঞ্চলে কম ঘন হবে এবং বেশি নিচু এলাকায় কোন বিন্দু বসবে না। আবার বিরল বসতিযুক্ত এলাকাগুলোতেও যেন বিন্দুবিহীন না থাকে। মানচিত্রে বিন্দু স্থাপনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন অংশই যেন বাদ না পড়ে।

বিন্দু পদ্ধতি ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা

সুবিধাঃ

১. কোন বস্তুর বন্টন দেখাতে বিন্দু পদ্ধতিতে সুবিধা অধিক। কারণ শস্যের উৎপাদন, চাষকৃত জমির বন্টন বা জনসংখ্যামূলক বিভিন্ন পরিসংখ্যান এ পদ্ধতিতে মানচিত্রে খুব সহজেই দেখান যায় এবং প্রকৃত সংখ্যা নির্দেশ করে।
২. এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন এলাকায় জনসংখ্যা অথবা অন্যান্য উৎপাদন বা দ্রব্যের বন্টনের যে পার্থক্য তার একটি তুলনামূলক চিত্র ফুটে ওঠে এবং বন্টনের পার্থক্যের কারণ সহজেই বোঝা যায়।
৩. এতে রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অঞ্চলের সমন্বয় ঘটে।

অসুবিধাঃ

১. বিন্দু পদ্ধতির মানচিত্রে বিন্দুর সংখ্যা অত্যধিক হলে প্রকৃত পরিমাণ বা প্রকৃত চিত্র ফুটে ওঠে না।
২. অনেক ক্ষেত্রে বিন্দুগুলো পরস্পর লেগে যায় বলে বন্টন সঠিক হয় না।

বিন্দু মানচিত্রঃ সমাধান

আজকের পাঠে বিন্দু পদ্ধতি ব্যবহার করে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব উপস্থাপন করব।
স্মারণি : সাবেক জেলাওয়ারি বাংলাদেশের জনসংখ্যা-১৯৯১

ক্রমিক নং	সাবেক জেলা	জনসংখ্যা (হাজার হিসেবে)	নির্ণেয় বিন্দু (১ বিন্দু=১,০০,০০০ জন)
১.	ঢাকা	১৩৮১৭	১৩৮.১৭
২.	কুমিল্লা	৮৬৫২	৮৬.৫২
৩.	চট্টগ্রাম	৭১৯৫	৭১.৯৫
৪.	জামালপুর	৩০৮৫	৩০.৮৫
৫.	পাবনা	৪৩০৫	৪৩.০৫
৬.	টাঙ্গাইল	৩০৪৪	৩০.৪৪
৭.	বগুড়া	৩৪৬০	৩৪.৬০
৮.	নোয়াখালী	৪৮৮৪	৪৮.৮৪
৯.	ফরিদপুর	৫৬১২	৫৬.১২
১০.	ময়মনসিংহ	৮০৩৫	৮০.৩৫
১১.	রংপুর	৮১৫৫	৮১.৫৫
১২.	কুষ্টিয়া	২৮৬৫	২৮.৬৫
১৩.	বরিশাল	৫৫৮২	৫৫.৮২
১৪.	যশোর	৫০০৬	৫০.০৬
১৫.	রাজশাহী	৬৭০৫	৬৭.০৫
১৬.	দিনাজপুর	৪০৪৪	৪০.৪৪
১৭.	পটুয়াখালি	২০৯১	২০.৯১
১৮.	সিলেট	৭০৫২	৭০.৫২
১৯.	খুলনা	৫২৬১	৫২.৬১
২০.	চট্টগ্রাম	৭৮৪	৭.৮৪
২১.	বান্দরবান	২৪৪	২.৪৪

বিঃদ্রঃ প্রতি জেলার জনসংখ্যাকে ১,০০,০০০ দিয়ে ভাগ করে জেলাভিত্তিক বিন্দু বের করা হয়েছে।

পদ্ধতিঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনসংখ্যার বন্টন দেখাতে বিন্দু পদ্ধতিই শ্রেয়। এক্ষেত্রে মানচিত্র তৈরি করার পূর্বে স্কেলটিকে সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হয়। স্কেল নির্বাচন উপাত্তের পরিমাণ ও মানচিত্রের আয়তনের ওপর নির্ভর করে। স্কেলটি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে একই স্থানে বিন্দুর সংখ্যা অযথা বেশি না হয়।
পূর্বের পাঠে বর্ণিত বিন্দু পদ্ধতি ব্যবহার করে মানচিত্রে জনসংখ্যার ঘনত্ব উপস্থাপন করুন।

চিত্রঃ ৩.৫.১.

পাঠ-৩.৬ সমরেখ পদ্ধতি (Isopleth Method)

এই অংশটি পাঠ করে আপনি-

- **মানচিত্রে সমরেখ পদ্ধতির উপস্থাপন সম্পর্কে ধারণা পাবেন ।**

পরিমাণগত বা ঘনত্ব জ্ঞাপক একই মান বিশিষ্ট বিভিন্ন স্থানকে মানচিত্রের উপর যে রেখা দ্বারা যোগ করা হয় সেই রেখাকে সমমান রেখা বা Isopleth line বলে। এ রেখা সমমান বিশিষ্ট অঞ্চলের ওপর দিয়ে টানা হয়। প্রকৃতিক বিষয় আবহাওয়া, জলবায়ু ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের উপাত্ত প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন- সমতাপ বা সমোষ্ণরেখা, সমচাপ রেখা, সমবর্ষণ রেখা এবং সমোষ্ণ রেখা।

সমোষ্ণ রেখা (Isothern line)ঃ ভূপৃষ্ঠের ওপর সমান তাপ বিশিষ্ট স্থানগুলোকে মানচিত্রের ওপর যে রেখা দ্বারা যুক্ত করা হয় সে রেখাকে সমোষ্ণ রেখা বলে।

সমচাপ রেখা (Isobar line)ঃ ভূপৃষ্ঠের ওপর বায়ুর সমচাপ বিশিষ্ট স্থানগুলোর ওপর দিয়ে যে রেখা টানা হয় তাকে সমচাপ রেখা (Isobar line) বলে।

সমবর্ষণ রেখা (Isohyet line)ঃ সম বৃষ্টিপাত যুক্ত স্থানগুলোর ওপর দিয়ে যে রেখা টানা হয় তাকে সমবর্ষণ রেখা বলে। সমান উচ্চতা বিশিষ্ট স্থানগুলোকে মানচিত্রের ওপর যে রেখা দ্বারা যোগ করা হয় তাকে সমোচ্চ রেখা বলে।

এ সমস্ত রেখা কাল্পনিক।

পদ্ধতিঃ

সমমান রেখা মানচিত্র অঙ্কন সম্পূর্ণ নির্ভর করে অঙ্কনে হাতের অভিজ্ঞতার ওপর। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই রেখার অঙ্কন যথাযথ হয়। এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের গাণিতিক উপস্থাপন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। একই উপাত্তসম্পন্ন স্থানগুলোকে একটি লাইনের মাধ্যমে যুক্ত করে সমমান রেখা অঙ্কন করা হয়। চিত্র ঃ-

সমমান রেখার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Isopleth) ঃ

১. সমমান রেখা অঙ্কনের জন্য সঠিক তথ্য বা উপাত্ত প্রয়োজন।
২. নির্ভূল মানচিত্র স্কেলের উপর নির্ভর করে সমমান রেখা নির্ধারিত ব্যবধানে আঁকা হয়।
৩. এই সমমান রেখা আঁকার জন্য যথার্থ নির্ভূল তথ্য থাকা প্রয়োজন।
৪. শূন্যমান বিশিষ্ট সমতল বা "ডেটাম" রেখা থেকে এরূপ রেখাগুলো গণনা করা হয়।
৫. সমমান রেখাগুলো কাছাকাছি হলে বিভিন্নতা বেশি এবং দূরে দূরে হলে বিভিন্নতা কম হয়।
৬. অনুপাত বা শতকরা মানচিত্রেও সমমানরেখা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
৭. এরূপ মানচিত্রে প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক সীমারেখার ভূমিকা থাকে না।

সুবিধা-অসুবিধা

সুবিধাঃ

১. মানচিত্রে সমরেখ পদ্ধতি প্রদর্শন খুবই সহজ। এটি অঙ্কনে কোন জটিলতা দেখা দেয় না।
২. সমরেখা দ্বারা সমমানের স্থানগুলো সহজেই বোধগম্য হয়।
৩. সুন্দর ও নির্ভূলরূপে এতে মানের ব্যবধানের বৈশিষ্ট্য বুঝা যায়। যেমন- ঘন ঘন রেখা হলে বিভিন্নতা বেশি এবং দূরে দূরে হলে বিভিন্নতা কম হয়।
৪. সাধারণত আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্যই এই পদ্ধতিতে বেশী দেখান হয়।

সমরেখ মানচিত্রঃ
সমাধান-১

আজকের পাঠে আমরা বাংলাদেশের মানচিত্রে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের সমবর্ষণ রেখা অঙ্কন করব।

অঙ্কন পদ্ধতি ঃ বাংলাদেশের মানচিত্রের ওপর প্রত্যেক বৃষ্টিপাত পরিমাণ কেন্দ্রের নির্দিষ্ট অবস্থানে ঐ সব স্থানের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ লিখতে হবে। অতঃপর ১০ ইঞ্চি ব্যবধানে ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০ ইঞ্চি প্রভৃতি সমবৃষ্টিপাত বিশিষ্ট রেখাগুলো অঙ্কন করতে হবে। সমোন্নতি রেখা অঙ্কনের পদ্ধতির অনুরূপ নিয়ম অবলম্বন করে এ রেখাগুলো অঙ্কন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ৬৭.৯ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত বিশিষ্ট সিরাজগঞ্জ এবং ৭৫.১ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত বিশিষ্ট কাপাসিয়ার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে ৭০ ইঞ্চি সমবর্ষণ রেখা অঙ্কন করতে হলে প্রথমে সিরাজগঞ্জ ও কাপাসিয়ার প্রকৃত অবস্থান স্থলদ্বয়কে একটি হালকা পেন্সিলের সরল রেখা (যা পরে মুছে ফেলা হবে) যোগ করতে হবে। এরপর ঐ রেখাকে ৭.২ ইঞ্চি ভাগে (৭৫.১ - ৬৭.৯ ইঞ্চি = ৭.২ ইঞ্চি) ভাগ করতে হবে; ফলে ৭০ ইঞ্চি রেখাটির স্থান কোথায় হওয়া উচিত তা সহজেই বোঝা যাবে। এরূপে ১০ ইঞ্চি ব্যবধানে সব কয়টি সমবর্ষণ রেখা অঙ্কন করতে হবে। মানচিত্রে ১২০ ইঞ্চি সমবর্ষণ রেখার উর্দ্ধে ব্যবধান ১০ ইঞ্চি রাখা হলে পরবর্তী রেখাগুলো প্রায় গায়ে গায়ে লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলার উত্তর অংশে ১১০ ইঞ্চি সমবর্ষণ রেখা ২০০ ইঞ্চি সমবর্ষণ রেখার মধ্যবর্তী অন্যান্য রেখাগুলোর ব্যবধান ২০ ইঞ্চি ধরা হয়েছে।

এ মানচিত্রে সমমান বিশিষ্ট রেখাগুলো দেখে এক দিকে যেমন এ দেশের প্রচুর বৃষ্টিপাত বিশিষ্ট অঞ্চল সনাক্ত করা যাচ্ছে অন্যদিকে তেমনই স্বল্প বৃষ্টিপাত বিশিষ্ট অঞ্চল চিহ্নিত করা যাচ্ছে। এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত রাজশাহী ও মেহেরপুর অঞ্চলে এবং সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত সিলেটের লালখান অঞ্চলে ও চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণে অনুষ্ঠিত হয়। মানচিত্রকে কতিপয় স্পষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত করে বলে ভূগোলের শিক্ষার্থীদের কাছে ঐ রেখাগুলোর গুরুত্ব প্রচুর। শিক্ষার্থীরা এ অঞ্চলগুলোতে জনসংখ্যার বন্টন ও ঘনত্বের ওপর বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা ও উচ্চতার প্রভাব পর্যালোচনা করতে পারে, কারণ এই ধরনের মানচিত্রে মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সুতরাং ভূগোলের আঞ্চলিকতার ধারণার সাথে সমমান রেখাগুলোর সম্পর্ক রয়েছে। এরূপ মানচিত্রে মাত্রিক বন্টন বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অঞ্চল গৌণ এবং মাত্রা বা পরিমাপ দ্বারা এরূপ অঞ্চল নির্ধারিত হয়। অনুরূপ পদ্ধতিতে সমচাপরেখা, সমতাপরেখা মানচিত্র অঙ্কন করা যায়। অনেক সময় ঋতু ভিত্তিক সমতাপ রেখা, সমচাপ রেখা বা সমবর্ষণ রেখার মানচিত্র অঙ্কনের প্রয়োজন হয়।

চিত্র: ৩.৬.১

সমরেখ মানচিত্রঃ সমাধান-২

আজকের পাঠে বাংলাদেশের জুলাই মাসের গড় তাপমাত্রা সমোষ্ণরেখার মাধ্যমে মানচিত্রে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করব।

চিত্র: ৩.৬.২

সমরেখ পদ্ধতি ঃ সমাধান ৩

আজকের পাঠে আমরা বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত (সেন্টিমিটারে) আঁকার চেষ্টা করব। এক্ষেত্রেও পূর্বের বর্ণিত পদ্ধতি ব্যবহার করব।

উত্তরমালাঃ ইউনিট-৩

পাঠ-৩.১ :

১.১. ভূগোলবিদ ১.২. ভৌগোলিক উপাত্ত ১.৩. প্রকৃতির ১.৪. বিন্দু ১.৫. লেখচিত্র

পাঠ-৩.২ :

১.১. মি ১.২. স ১.৩. স

পাঠ-৩.৩ :

১.১ বিন্যাস বা ঘনত্ব ১.২ হালকা ১.৩ বন্টনমূলক ১. ৪ প্রশাসনিক